INDIA IN TRANSITION

Special COVID-19 Series: Part 2

স্বাস্থ্যের সিকিউরিটাইজেশান এবং গণতন্ত্রের নিগ্রহঃ কোভিড-19 বিষয়ে নির্ধারিত নীতি ও রাজনৈতিক তাৎপর্য

বিবেক এন. ডি.

৩০ আগস্ট, ২০২১

নভেল করোনাভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধ করার জন্য, ২০২০ সালের মার্চ মাসের ২৪ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা ভারতে লকডাউন ঘোষণা করেন। এর পরই, চার মাস ধরে শাহিনবাগের যে মঞ্চে ঠাকুমা, দিদিমা, শিশু, ছাত্রছাত্রী এবং উদ্বিগ্ন নাগরিকরা ভারতের বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জী বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনজ-এর প্রতিবাদে একত্রিত হয়েছিলেন, সেই মঞ্চ দিল্লী পুলিশ গুঁড়িয়ে দেয়। সারা ভারতে নাগরিক আইনের প্রতিবাদে যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল তার কেন্দ্র ছিল শাহিনবাগের প্রতিবাদস্থল। পুলিশের এই জাতীয় কঠোর পদক্ষেপের একটি বিশেষত্ব ছিল। প্রকাশ্যভাবে এর কারণ ছিল কোভিড-19 অতিমারীর বিরুদ্ধে সতর্কতা। এই সময়ে ভারতে ৫২৪ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে, প্রতিবাদী কন্ঠস্বর রোধের জন্য রাষ্ট্র অতিমারীর ঘটনাকে ব্যবহার করেছে। অনেক রাজ্যেই লকডাউন চলাকালীন পুলিশী বর্বরতার ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন ভিডিয়োর মাধ্যমে মিডিয়া স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে কিভাবে নিরাপত্তার নিয়মাবলী লঙঘন করার জন্য অনেক মানুষই পুলিশের লাঞ্ছনার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং এর ফলে অন্তত পনের জনের মৃত্যু হয়েছে।

সত্যি বলতে, ভারতই একমাত্র দেশ যে বিক্ষোভকারী নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে এমন নয়। কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিলিপাইনও একই উপায় অবলম্বন করেছিল। তবে সমস্যা হল, সিকিউরিটাইজেশান বা নিরাপত্তাকরনের নামে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে তাতে যেন "বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র" হিসাবে পরিচিত ভারত তার গণতান্ত্রিক নীতি থেকে সরে গেছে বলে মনে হচ্ছে এবং সেই

পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্নও ওঠে নি। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময়, এই সিকিউরিটাইজেশানের জন্যই, রাষ্ট্রের সংগৃহীত সংক্রমণের পরিসংখ্যানের মধ্যে অসঙ্গতি প্রকাশ্যে এনেছেন যে সাংবাদিকরা, অসংখ্য ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য সক্রিয় প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যে কোন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর সামান্যতম বাধা ছাড়াই চড়াও হওয়ার জন্য রাষ্ট্র এই অতিমারীকে তৈরি অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে। এ এমন একটি ব্যতিক্রমী অবস্থা যখন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, যেন জনকল্যাণের জন্যই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

সিকিউরিটাইজেশানের সংজ্ঞা

সিকিউরিটাইজেশান এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি সমস্যাকে অস্তিত্বের সংকট হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ও তাকে নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করা হয়। এর ফলে, রাষ্ট্র এমন কিছু নীতি প্রয়োগ করতে শুরু করে যা সাধারণ গণতান্ত্রিক শর্তগুলিকে উপেক্ষা করে। নিশ্চিতভাবে, সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক সময়ে এই জাতীয় পদক্ষেপ কখনোই মেনে নেবেন না। ব্যারি বুজান, ওলে ওয়েভার এবং জাপ ডি উইল্ড তাঁদের সুচিন্তিত *সিকিউরিটিঃ এ নিউ ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যানালিসিস* সিকিউরিটাইজেশান নামের বইতে সিকিউরিটাইজেশানকে এমন একটি বিপদ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন যা "রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক সীমানার বাইরে ঘটা কার্যকলাপকে" বাধা দেয় এবং তাকে ন্যায্য বলে প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এবং স্বাস্থ্যের "সিকিউরিটাইজেশান"

কেন্দ্রসরকারের নির্দেশ অনুসরণ করে সারা ভারতের রাজ্যে রাজ্যে স্বাস্থ্যকে সিকিউরিটাইজ করা হচ্ছে। জনগণের মধ্যে কোভিড-19 রোগের বিস্তার রোধ করতে যাঁরা নির্দেশিকা লঙ্ঘন করবে তাঁদের বিভিন্ন ধরনের জরিমানা করার মত নিষেধাত্মক ও শাস্তিমূলক পন্থা নিয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কোভিড-19 গভর্নমেন্ট রেসপন্স ট্র্যাকার কঠোরতার সূচকে ভারতের লকডাউন বিশ্বের কঠিনতম লকডাউনের মধ্যে একটি বলে ব্যাখ্যা করেছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে মুক্ত পরিসরে তথ্যের সহজলভ্যতার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রেস ও মিডিয়াও গণতন্ত্রের একটি প্রাথমিক স্তম্ভ। প্রশাসনিক নির্দেশাবলী এবং অন্যান্য নির্দেশিকা জনসাধারণের সামনে আনার জন্য এঁদের ভূমিকা, বিশেষ করে এরকম একটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংকটের সময়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

লকডাউনের সময় এবং তার পরেও মিডিয়ার কন্ঠস্বরকে রাষ্ট্র যে রকম কঠোরভাবে দমন করেছে, রাইটস অ্যান্ড রিস্কস অ্যানালিসিস গ্রুপ, নিউ দিল্লীর একটি মানবাধিকার প্রচারকারী সংস্থা "ইন্ডিয়াঃ মিডিয়া'জ ক্র্যাকডাউন ডিউরিং কোভিড-19 লকডাউন" নামের উত্তপ্ত বিবৃতিতে তার তীব্র সমালোচনা করেছে।

কোভিড-19 সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখা ও নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অনুশীলনের জন্য পঞ্চান্নজন সাংবাদিক আইনী নোটিস পেয়েছেন, গ্রেপ্তার হয়েছেন আর এমনকি, লাঞ্ছনা ও ভীতিপ্রদর্শনেরও মুখোমুখি হয়েছেন।

সমস্ত অপ্রয়োজনীয় জনসমাবেশ প্রতিরোধের জন্য অনেক রাজ্যই ঔপনিবেশিক যুগের মহামারী রোগ আইন ১৮৯৭ বা এপিডেমিক ডিজিজেজ অ্যাক্ট (ইডিএ) 1897 তুলে এনেছে। এর মাধ্যমে যে রাজ্যসরকারের আধিকারিকরা ইডিএ অনুযায়ী কাজ করবেন তাঁদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ধারা ৪ উল্লেখ করে, "এই আইনের অধীনে যদি কোন কাজ সম্পন্ন হয় বা সরল বিশ্বাসের সঙ্গে কোনও কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্য যদি কোন ব্যক্তির থাকে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা বা অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না"। ২০২০ সালের আগস্ট মাসের শুরুতে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সরকার ঝাড়খন্ড সংক্রামক রোগ আইন ২০২০ বা ঝাড়খন্ড কন্টেজিয়াস ডিজিজ অর্ডিন্যান্স 2020 চালু করেন। এই আইন অনুযায়ী, নিরাপত্তা রক্ষার নির্দেশাবলী মেনে না চললে দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে। যে দেশে তিরাশি শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন, সেই দেশে এই ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপের বিরূপ প্রভাব সরাসরি পড়ে ঠিক তাঁদের উপর যাঁদের কোন রকম আর্থসামাজিক রক্ষাকবচ নেই।

২০২১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে "দ্বিতীয় ঢেউ" শুরু হওয়ার পর প্রায় সমস্ত রাজ্য ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী সান্ধ্য আইন বা কারফিউ জারি করে। এই কারফিউ-এর সময়সীমার মধ্যে অসামঞ্জস্য ছিল এবং অনেক সময়ই ঠিক কোনগুলিকে অপরিহার্য পরিষেবা সংক্রান্ত যাতায়াত বলে ধরা হবে সে বিষয়ে বিভ্রান্তিকর ও বৈপরীত্যপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল। এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যাতায়াতের জন্য অসংখ্য জটিল পরীক্ষা এবং কেন্দ্র সরকারের আরোগ্য সেতু স্মার্টফোন অ্যাপ ও প্রতিটি রাজ্য, জেলা ও পৌরসভার নিজস্ব অ্যাপসহ ট্রেসিং অ্যাপের মাধ্যমে ছাড়পত্র পেতে হয়েছে। অনেক রাজ্যে আবার এক জেলা থেকে অন্য জেলায় আভ্যন্তরীণ যাতায়াতও নিষিদ্ধ ছিল। নাগরিকদের পুলিশের কাছ থেকে কোভিড-19 সংক্রান্ত বিশেষ নিরাপত্তার ই-পাস জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গে এমন নির্দেশাবলীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে যে ক্রমান্বয়ে বদলান হচ্ছিল।

জনসাধারণের মানসিক অবস্থা ও চিন্তাভাবনার তত্ত্বাবধান করা সরকারের একটি প্রাথমিক উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময় কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকার, বিশেষত উত্তর প্রদেশে, শাস্তিদান এবং আইনী হুমকির সাহায্যে জনগণকে সোশ্যাল মিডিয়াতে চিকিৎসা ও ওষুধের আবেদন করতে নিরস্ত করার চেষ্টা

করেছেন। সরকারের দাবি ছিল যে এই জাতীয় আবেদন থেকে অযথা ভীতি তৈরি হয় এবং রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়।

প্রযুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের কৌশল

কোভিড-19 পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য, স্থানীয় আর্থসামাজিক বাস্তবতার কথা বিচার না করেই, রাজ্যসরকারগুলিও ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং নজরদারির পন্থা অবলম্বন করেছে যা সাম্প্রতিক আইনগত পরিকাঠামোকে উল্লঙ্ঘন করে। এই ডিজিটাল ট্র্যাকিং এবং ট্রেসিং-এর উপায়গুলির মধ্যে একটি হল বৈদ্যুতিন এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক বা মিনিস্ট্রি অফ ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশান টেকনোলজির অধীনে জাতীয় তথ্যবিদ্যা কেন্দ্র বা ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টারের তৈরি আরোগ্য সেতু স্মার্টফোন অ্যাপ। অনেক রাজ্যই নিজেদের ব্যবহারের জন্য স্থানীয় ভাষায় অ্যাপ তৈরি করেছে। বেশ কিছু সামান্য পরিচিত ছোট ছোট বেসরকারী আইটি সংস্থা কমপক্ষে বাষট্টিটি অ্যাপ তৈরি করেছে যেগুলিকে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার, সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য পরিষেবামূলক সংগঠন, পৌরসভা কর্তৃত্ব এবং পুলিশ ব্যবহারের জন্য চালু করেছে। কি ভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয় বজায় রাখা হবে তা এবং অ্যাপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হবে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশিকা এই অ্যাপগুলিতে নেই। "গোষ্ঠী পরিচালিত ছোঁয়াচ চিহ্নিতকরণের অ্যাপ" হিসাবে প্রচারিত আরোগ্য সেতু একজন ব্যবহারকারীর থেকে অন্য ব্যবহারকারীর কোভিড-19 রোগের সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা হিসাব করার জন্য লিঙ্গ, বয়স এবং ব্যক্তিগত ঠিকানা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে। এরপর এই তথ্য কেন্দ্রসরকারের অধীনস্থ ইন্টিগ্রেটেড হটস্পট অ্যানালিসিস সিস্টেম নামে অন্য একটি পরিসরে বিশ্লেষণ করা হয়। এবার কোন ব্যবহারকারীর নাম ব্যবহার না করে এই বিশ্লেষণের ফলাফল রাজ্য এবং জেলা কর্তৃপক্ষকে পাঠান হয়। তবে, যেহেতু ছোঁয়াচ চিহ্নিতকরণের জন্য অ্যাপ ব্যবহারকারীর মোবাইল ফোনের নম্বর কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়, তাই গোপনীয়তা রক্ষা সম্ভব হয় না এবং পুলিশ, ইনটেলিজেন্স সংস্থা বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে অন্য বেসরকারী সংগঠনের কাছে এই নম্বর পৌঁছে যেতেই পারে।

এখনও ভারতের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা আইন বা পারসোনাল ডেটা প্রোটেকশান অ্যান্ড প্রাইভেসি ল-এর প্রচলন হয় নি এবং আরোগ্য সেতু অ্যাপ নানা কারণে কঠোর সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। এই কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি হল, অ্যাপ প্রস্তুতকারীদের দায়িত্বজ্ঞান (যেহেতু অ্যাপটি সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে এবং এটি বানিয়েছেন যে স্বেচ্ছাসেবীরা তাঁরা কোন দলের সঙ্গে সংযুক্ত তা জনসমক্ষে আনা হয় নি), বিমান বা রেলযাত্রার সময় বাধ্যতামূলকভাবে এই অ্যাপটি ইনস্টল করা, এবং অতিমারী প্রশমনের জন্য কোন বাস্তবিক ফলাফল ছাড়াই অকাতরে অর্থব্যয় করা।

যদিও সরকারের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে অতিমারীর পর এই অ্যাপ আর ব্যবহার করা হবে না, কিন্তু জাতীয় স্তরে স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় তথ্যকে ডিজিটাইজ করার জন্য যে জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা ন্যাশনাল হেলথ ডিজিটাল মিশন প্রতিষ্ঠার খসড়া হিসাবে এই অ্যাপকে এগিয়ে দেওয়া হতে পারে। এর সঙ্গে জড়িত আছে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা প্রদান এবং তার সুযোগ পাওয়ার প্রেক্ষিতে নানা ধরনের গোপনীয়তা সংক্রান্ত সমস্যা এবং নৈতিকতার প্রশ্ন। সিকিউরিটাইজেশান প্রক্রিয়ার আড়ালে, উপযুক্ত সুরক্ষা এবং সতর্কতা ছাড়াই সরকার জনগণের স্বাস্থ্য বিষয়ে যে বিশাল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করছেন, তা ভবিষ্যতে ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এছাড়াও কোয়ারেন্টাইনের নির্দেশাবলী না মেনে যাঁরা ঘোরাফেরা করছেন তাঁদের বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য পুলিশ ড্রোন, সিসিটিভি ফুটেজ এবং ফেসিয়াল রেকগনিশান সফটওয়্যারের মত অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমেও জনগণের চলাচল অনুসরণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই স্বাস্থ্য সংকটের সময়, ন্যূনতম স্বচ্ছতা বা আইনী সুরক্ষার সুযোগ ছাড়াই প্রযুক্তিগত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের হাতে থাকা অপরিমেয় ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি বেড়েই যাচ্ছে।

ভারতের কোভিড-19 অতিমারীর দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময়, অক্সিজেন, জীবনদায়ী ওষুধপত্র এবং একটি সর্বাঙ্গীণ সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাবে সারা দেশ আক্ষরিক অর্থেই ধুঁকছে। এ কথা স্পষ্ট যে, প্রথম ঢেউ-এর সময়, যখন চিকিৎসা পরিষেবার পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর সুযোগ ও সময় দুইই কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের হাতে ছিল, তখন সেই কাজ করার বদলে তাঁরা স্বাস্থ্যব্যবস্থার সিকিউরিটাইজেশান এবং গণতন্ত্রের কন্ঠরোধের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম অনুদান ও কর্মীর উপর নির্ভর করে চলতে থাকা সরকারী স্বাস্থ্যব্যবস্থা কখনই অগ্রাধিকার পায় না। এমন অবস্থায়, একটি প্রবল ক্ষমতাশালী কেন্দ্রসরকারের কাছে কোন বিষয়গুলি সত্যিই অগ্রাধিকার পায় এবং ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কোন বিষয় বেছে নেন, তার থেকে এই অতিমারীর উপর যে পরিকাঠামোগত এবং সুদীর্ঘ প্রভাব পড়ে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়ঃ গণতান্ত্রিক নীতি পরিহার করে চরম কোন পন্থা গ্রহণ করাকে স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন চর্চা করে তুলতে গিয়ে অগণিত নাগরিকের জীবন বিপজ্জনক অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

বিবেক এন. ডি. হায়দ্রাবাদের মহিন্দ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি পলিটিক্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি